প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ সাধারণ আলোচনা

১.১. প্রস্তাবনা -

> "আমার বীণায় অনেক বেশি তার — সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল — কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। ... কিন্তু আমার স্বধর্ম কি তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুঁচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয় — রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি - সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে।" [১]

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে বিচরণকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের দিকে তাকিয়ে এ কথাগুলি বলেছেন। চিরাচরিত সমালোচনার দৃষ্টিতে তবুও রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর কবি প্রতিভার প্রচণ্ড প্রভাবের জোরেই অপরাপর সাহিত্যমাধ্যমগুলি উৎড়ে গেছে — এমন মতামত আমাদের সাহিত্য আলোচনায় দৃঢ় প্রোথিত। বিশেষতঃ তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে এ-ধরনের মত প্রকাশ করেছেন বহু প্রাজ্ঞ সমালোচক। তাঁদের মতে রবীন্দ্রপ্রতিভা উপন্যাস রচনার উপযোগী ছিল না।[২] এক্ষেত্রে কখনও চরিত্রের অসঙ্গতি, Form এর ত্রুটি প্রভৃতি সহ যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হল বাস্তবতার অভাব। কিন্তু রবীন্দ্র উপন্যাসের সচেতন পাঠে এমনটি আমাদের মনে হয় না, বরং তাঁর উপন্যাসগুলি যে বিশেষ অর্থেই আধুনিক, এমন বোধই আমাদের জন্মায়। 'সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই।'[৩] এর পাশাপাশি উদ্ধৃত

করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের আত্ম বিশ্লেষণ — 'আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'— অর্থাৎ এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমের উপকরণ এবং প্রকরণের বিন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতনই শুধু ছিলেন না, তিনি কবিতার মধ্যদিয়ে যে নিজেকে পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারেন নি বা সম্ভবও ছিল না - এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিষয় বা বক্তব্য অনুযায়ী এক-একটি সাহিত্যমাধ্যমের আশ্রয় নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এমন সব বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন যা কবিতা বা নাটক বা গান বা ছোটগল্পে ঠিক সেরকম ভাবে করা হয়তো সম্ভব ছিল না। অথচ 'ছাঁট দেওয়া সত্য' তাঁর কাম্য ছিল না, তাই উপন্যাসের শিল্পকলাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। আর উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু ঘটনা নয় বরং চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তাই ঘাটনিক বাস্তবতা নয় বরং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দিকে সঙ্গত কারণেই তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, বিশেষ ভাব বা বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবার জন্য গড়ে নিয়েছেন উপযোগী Form, আর ঠিক এ কারণেই প্রচলিত উপন্যাসভাবনা দিয়ে রবীন্দ্র উপন্যাসের বিচার যথার্থভাবে করা যায় নি। বিষয়টি পরিষ্কার হবে *চোখের বালি*র পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের পাশে রবীন্দ্র উপন্যাস রাখলে।

১.২.১. বঙ্কিম-উপন্যাস ঃ বিরুদ্ধ সমালোচনার আবর্তে -

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে *আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), হুঁতোম প্যাঁচার নক্শা (১৮৬২),* প্রভৃতির মত কথাসাহিত্যের একটি মাধ্যম প্রচলিত ছিল। একটা সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত ইউরোপীয় উপন্যাসপাঠে অভ্যস্ত বাঙালী মনকে আলালী সাহিত্য আর দোলা দিতে পারল না।[৪] ইংরেজী শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম চাইছিল এমন বাংলা আখ্যান যা ইংরেজী নভেলের মতই হবে নিটোল প্লটের বাঁধুনিযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাজটিই করলেন সে সময়। অর্থাৎ বঙ্কিমের উপন্যাস লেখার পূর্বেই উপন্যাস কি বস্তু সেটা আমরা জেনেছিলাম, উপন্যাসের বিন্যাস সম্পর্কেও আমরা

অবহিত ছিলাম, শুধু অপেক্ষা ছিল ইংরেজী নভেলের বাংলা সংস্করণ, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী নভেলের আদর্শটিকে গ্রহণ করে বাংলায় উপন্যাস লিখলেন।

> "বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয়েছিল ইংরেজী নভেলের একটি বিশেষ ধরণকে আদর্শ করে।... উপন্যাস পড়তে পড়তেই তো আমাদের ভিতরে উপন্যাসের সংজ্ঞা তৈরি হয়ে ওঠার কথা। এমনকি প্রথম যে ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস বা গল্প লেখেন তাঁরাও ত লিখতে লিখতেই উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞাটি নিজের কাছে তৈরি করে নেন। সংজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা স্থির ধারণা থাকে না বলেই ত উপন্যাস বা গল্প, বা যাকে আমরা গদ্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য বলি, তার বিকাশের প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে অভাবিত ও অনিশ্চিত অথচ তার চরিত্র বা সংজ্ঞা তারই মধ্যে একধরনের স্পষ্টতা পেতে থাকে।... বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বা কাহিনীগদ্যের যে ধরনটি, যে ফর্মটি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ভিতর কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না, কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। কারণ, তাঁর কাছে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র মডেল। সেরকমভাবে উপন্যাস লিখলেই বাংলায় উপন্যাস হবে, না হলে হবে না।"[৫]

ইয়োরোপীয় নভেলের আদর্শে বাংলায় টান টান উত্তেজনাপূর্ণ প্লট তৈরি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সমস্যায় পড়লেন উপাদানের ক্ষেত্রে। বাঙালী মধ্যশ্রেণী তখন সবে মাত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছে, এরকম একটি সৃজ্যমান অনাড়ম্বর শ্রেণী আর যাই হোক ইয়োরোপীয় নভেলের বাংলা সংস্করণের চরিত্র হতে পারে না, সেই বীরত্ব, সেই মহত্ত্ব, বিরাট ত্যাগ কিংবা বিরাট প্রেম প্রভৃতি বিষয়গুলি যা যা বঙ্কিমের মতে উপন্যাসে জরুরী তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরবর্তী যে আপামর জনসাধারণ, তাদের জীবনযাত্রা এত স্থির, এত নিশ্চল নির্জীব যে তারা *বঙ্গদেশের কৃষক* এর বিষয় হতে পারে কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের নয়। একারণেই, অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয়ের সন্ধানে বঙ্কিমকে তাই পাড়ি দিতে হল ইতিহাসে, যেখানে অন্তঃপুরবাসিনী সর্বসমক্ষে অনায়াসে বলতে পারেন 'বন্দী

আমার প্রাণেশ্বর'। আর এই ইতিহাসের জ্ঞান যেখানে বঙ্কিমের কাছে ঝাপসা হয়েছে, সেখানেই তিনি রোমান্স মিশিয়ে গল্পকে পরিপূর্ণ করেছেন। সদ্য বিলুপ্ত সামন্ত সমাজ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট নতুন জমিদার সমাজ যেখানে বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয় হয়েছে সেখানেও সামাজিক সমস্যার গভীরে দৃষ্টিপাত কিংবা চরিত্রের অন্তর্জগত নয়, বরং গল্প জমাবার খাতিরে এদের ব্যবহার করা হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাস যাকে আমরা সামাজিক উপন্যাস বলে থাকি সে সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন —

> "ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণের স্তরগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতায় বিকশিত হইয়া উঠে নাই ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা সহসা উদঘাটিত হইয়া একটা বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া আবার সংকুচিত হইয়া অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে পাঠকের মনে বাস্তবতার অনুভূতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ হয়তো ছিলেন না, কারণ বাস্তবনিষ্ঠাপেক্ষা আদর্শ ও রোমান্সনিষ্ঠা ছিল তাহার প্রবল।"[৬]

প্রায় একই রকম মূল্যায়ন পাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখাতেও -

> "পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাই আগা-গোড়া কাহিনীকেই প্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলো এক একটি নিটোল সমাপ্তি পায়। ... মানুষের জীবন প্রবাহকে তুলে ধরা উপন্যাসের কাজ, সেখানে একটি নতুন ইঙ্গিত দিয়ে পরবর্তী সম্ভাবনার ইতিবাচক নেতিবাচক যাই হোক না কেন - কথা বলা হয়। এই কারণেই সমাজ – সমাজের চলিষ্ণু চেহারাটি উঠে আসে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে শেষ হয়ে যায় না, ও সামাজিক সংগ্রাম ও কর্ম, দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের ভেতর তাঁর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রয়ে যায়। সমাজ বাস্তববোধের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে পারেন নি। ঔপন্যাসিকের ইচ্ছাপূরণে সহায়ক এমন নিটোল পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের বেশিরভাগ উপন্যাসকে বাক্সবন্দী কাহিনীতে পরিণত করেছে। অথচ শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি সবসময়ই একটি বড় রকমের প্রশ্ন বা কমপক্ষে অস্বস্তির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়

ঃ পাঠক নিজের ভেতরে নতুন করে তাকান।”[৭]

ইয়োরোপীয় উপন্যাসের এই ফর্ম-এর অনুকরণের সাথে সাথে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যানকে অলংকারবহুল অতিপল্লবিত করার যে বৈশিষ্ট্য – তাকেও গ্রহণ করেছেন।

১.২.২. বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ ঃ প্লট থেকে চরিত্র -

এ তো গেল একরকম ভাবে বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল্যায়ন, যার বিপ্রতীপে রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়। আবার একটু অন্যরকম ভাবেও বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র উপন্যাসের বিশেষত্ব সন্ধান করা যেতে পারে। প্লট এবং চরিত্র কোনটার গুরুত্ব বা প্রাধান্য বেশি, এ নিয়ে তর্ক এ্যারিষ্টট’লের সময় থেকেই চলে আসছে, যা বঙ্কিমের সময়েও ছিল। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ সচেতন ভাবেই চরিত্রের চাইতে প্লটের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ‘সম্ভবতঃ’ শব্দটি ব্যবহার করার পেছনে কারণটি হল, বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের নামকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে এমন একটা ধারণা হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের কোন বিশেষ চরিত্রই যেন ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, যেমন *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ* প্রভৃতি। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র *সীতারাম* উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে যখন লেখেন – ‘উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন’ তা চরিত্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতনতারই পরিচয় দেয়। তাহলে এমনটা মনে করা খুব একটা অযৌক্তিক হয়তো হবেনা যে চরিত্রের প্রতি মনোযোগী থাকলেও এ্যারিষ্টট’লপন্থী বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় প্লটের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন। এটাও তো আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিটোল প্লট রচিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* সেদিনের পাঠকসমাজে কিরূপ সাড়া ফেলেছিল, *দুর্গেশনন্দিনী* তৎকালপ্রচলিত সাহিত্যরুচির কতখানি প্রতিস্পর্ধী ছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে –

“১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত

হয়। আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে 'বিজয় বসন্ত' 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরনের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত হংসরূপী রাজপুত্র, চক্‌মকির বাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ছোটগল্প এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথাগ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। আলালের ঘরের দুলাল তাহার মধ্যে একটু নতুন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণশক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবিনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"[৮]

আমাদের ধারণার সমর্থনে সমালোচক জ্যোতির্ময় ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"বঙ্কিমচন্দ্র 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া' ও 'চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণ' - উভয়েরই গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী', থেকে 'রাজসিংহ'র চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনব্যাপী তিনি চেষ্টাও করে গেছেন এই উভয়েরই মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্যস্থাপনের। কিন্তু সেই দুর্লভ সামঞ্জস্যস্থাপনে তাঁর মহৎ ব্যর্থতাই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে 'চোখের বালি'তে এসে চরিত্রসৃষ্টিতে অধিকতর মনোনিবেশ করতে প্রণোদিত করেছে। ... কার্যত যদি দেখা যায় যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' - মূলত ঘটনাবর্তে ভাসমান কয়েকটি চরিত্রের কাহিনিমাত্র হয়ে উঠেছে এবং তাদের না-বলা বাণীর অন্তরঙ্গ দলিল হয়ে ওঠেনি, তবে বুঝতে হবে, এই সব রচনায় চরিত্রের চেয়ে ঘটনা-বিন্যাসের প্রতি লেখকের মনোযোগ ছিল অধিকতর নিবদ্ধ। আর সেইটাই ছিল প্রত্যাশিত। কারণ আগেই

বলা হয়েছে, প্রাক্-বঙ্কিম বাঙালি লেখকগণের মধ্যে কেউ উপন্যাস লিখতে গিয়ে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়ার প্রাথমিক কাজেও সিদ্ধি ও স্বার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। সুতরাং পথিকৃত বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্তত সেই প্রাথমিক কাজটি সর্বাগ্রে সু-সম্পন্ন করতে হবে।"[৯]

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিচরিত্রের সম্ভবপরতা ও নিত্যতার অন্বেষণে সচেতনভাবেই চরিত্রের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

"ঘটনাবহুল, চরিত্রবহুল, ঘটনাচাতুর্যে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসের যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের দৌলতে বাংলায় প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) তা পরিহার করেছিলেন। ব্যক্তিত্বোদ্ভূত সমস্যা, কয়েকটি চরিত্র, তাদের মনস্ক্রিয়ার বর্ণনা, অনতিব্যাপ্ত স্থান এবং নাতিদীর্ঘ কাল তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। উত্তাল ঘটনাস্রোতের পরিবর্তে তিনি হাজির করেছেন উত্তেজক চরিত্র, তারা ব্যক্তিত্বশক্তিতে উস্কীপ্ত করে, বাহাদুরি করে ভোলায় না। ভাঁজে ভাঁজে তিনি খুলে দিয়েছেন সেই সব চরিত্রের মনের জগৎ।"[১০]

বস্তুতঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সময় এক ছিল না, দুটি সময়ের চাহিদাও এক ছিল না। *চোখের বালি* ও *নৌকাডুবি* প্রকাশের বহু পরে লিখিত উপন্যাস দুটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাঁপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। ... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।' (চোখের বালির সূচনা, বৈশাখ ১৩৪৭) এবং 'সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।' (নৌকাডুবির সূচনা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) অর্থাৎ 'এখনকার ছবি', 'নবপর্যায়ের পদ্ধতি', 'সময়ের দাবি',

'একালে' প্রভৃতি শব্দগুলি যুগচাহিদা অনুযায়ী দুটি সময় যে আলাদা এবং প্লটের ওপর অধিক গুরুত্ব যে বঙ্কিমের সময়ের চাহিদা ছিল সেদিকেই যেন ইঙ্গিত করে।

প্লট না চরিত্র এই 'কালোচিত দ্বিধাজনিত দুর্বলতায়' রবীন্দ্রনাথ *করুণা* (১৮৭৭) *বউ ঠাকুরানীর হাট* (১৮৮৩) এবং *রাজর্ষি* (১৮৮৭) লিখলেও চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা এই উপন্যাস গুলোতেও লক্ষ্য করা যায়। এর পনেরো বছর পর রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ রূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন *চোখের বালি* প্রকাশের মধ্য দিয়ে। "একান্ত মনস্তাত্বিক উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে যেখানে থেমে যেতে হয়েছিল, সেখানথেকেই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রা আরম্ভ করতে হল। সাহিত্যের বিচারে *চোখের বালি* থেকেই বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমোত্তর আধুনিক ধারার সূত্রপাত।"[১১] আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সমালোচক অমরেশ দাশের সুচিন্তিত মন্তব্য থেকে –

> "কাহিনীর চমৎকারিত্ব থেকে ব্যক্তিচরিত্রের মর্মগত চমৎকারিত্বে সরে গিয়ে বাংলা উপন্যাসকে তিনি নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছেন ... চমকপ্রদ কাহিনী তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না বলে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের বদলে তিনি মনোযোগী হয়েছেন সমকালীন বাস্তবে।"[১২]

সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনাকালেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন –

> "বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরি যে বঙ্কিমচন্দ্র, একথা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েও বলবো যে, বঙ্কিম-উপন্যাস থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের অন্বিষ্ট অনেকাংশে পৃথক। রবীন্দ্র উপন্যাসে ঘটনা-প্রাধান্যকে ছাপিয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তার উন্মোচন-প্রয়াসই মুখ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তা নয়। ফলে দুজনের উপন্যাসের নির্মাণরীতিতে প্রায় মৌলিক পার্থক্য।"[১৩]

অন্যত্র

"বিশ শতকের আধুনিক ঔপন্যাসিকের চোখে উপন্যাস নিছক গল্প বলার উপলক্ষমাত্র নয়, তা আসলে উপন্যাসধৃত নরনারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ-বিবর্তনের ইতিবৃত্ত, ... বাংলা উপন্যাসে এই প্রবণতা প্রথম বলিষ্ঠ রেখায় ফুটে উঠল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই দেখতে পাই, সেখানে কেবল ঘটনার জন্য ঘটনা নয়, এমনকি ঘটনার যথেষ্ট প্রাধান্য ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে লেখক আদৌ আগ্রহীও নন। তাঁর উপন্যাসে ঘটনা মুখ্যত ব্যক্তিচরিত্রের আত্মবিকাশ তথা আত্মাবিষ্কারের অবলম্বন বিশেষ।"[১৪]

লক্ষণীয় *রাজর্ষির* পর *চোখের বালি*, দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস রচনায় অগ্রসর না হলেও এসময় টলষ্টয়, এমিল জোলা, জর্জ এলিয়ট, মৌরস য়োকাই থেকে শুরুকরে বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ*, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের *ফুলজানি*, সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* ও শিবনাথ শাস্ত্রীর *যুগান্তর* সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এইসমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং বিক্ষিপ্ত মন্তব্যসমূহ কালানুক্রমিক ভাবে লক্ষ্য করলে উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন তা বোঝা যায়, পরিচয় পাওয়া যায় এ বিষয়ে তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার।

১.২.২.১. ঔপন্যাসিক যখন সমালোচক -

(১৮৮৬) (ফুলজানি) "ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার) আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি।"[১৫]

(১৮৮৮) "আপনার 'ফুলজানি' আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি ... আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। ... আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না —

সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। ... প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যে সব ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউকথাকও'এর গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে সকল আকাঙ্খাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। ... বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন। ... কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি।"[১৬]

(১২৯৮) "আমার বোধ হয় ইংরাজি সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে – তিন ভল্যুম না হলে নভেল হয় না ... জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো - এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত।"[১৭]

(১২৯৯) "লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতা বলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নতুন নতুন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানব প্রকৃতি দুইই সম্বন্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।"[১৮]

(১২৯৯) "লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবাচিন্তা সব সুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। ... আমার জীবনের সেই মূল তত্ত্বটি, জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে, সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মা-স্বরূপে বিরাজ করবেই। ... মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে; এই জন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না।"[১৯]

(১২৯৯) "একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে।"[২০]

(১২৯৯) "গোতিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেছেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখতে পাই নে। ... মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠছে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক, ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এইজন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য।"[২১]

(১২৯৯) "অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে; সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী।"[২২]

(১২৯৯) "সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। ... জোলা অশ্লীল; কেননা

তা কেবল আংশিক অনাবরণ। ... সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে জোলার নভেলে কোনো দোষ দেখতুম না।"[২৩]

(১২৯৯) " নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতি বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ।"[২৪]

(১৩০০) "এই গ্রন্থবর্ণিত (রাজসিংহ) পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। ... কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।"[২৫]

(১৩০০) "আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ংকর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানিনা, কিন্তু আমাদের মত পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে। ... সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।"[২৬]

(১৩০০) "বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করিতে হয়।"[২৭]

(১৩০১) "সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু'নামক য়োকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ... যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, ... আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালোমন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুতবেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ। ... আমরা নিক্তি হস্তে

লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি- সূর্যমূখী কুন্দনন্দিনীর অপেক্ষা এক-মায়া এক-রতি-পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কি না, ... আমরা জিজ্ঞাসা করি না – কোনটা যথার্থ, কে মানুষের মতো, কে সজীব, কোন চরিত্রের মধ্যে হৃদয়স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।"[২৮]

(১৩০১) "বিচিত্র মতামত এবং তর্কবিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার (শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর') পঞ্চু, ব্রজরাজ, সুরেন্দ্র গুপ্ত, মথুরেশ, এমন কি নবীনও খুব ভালো ছেলে বটে কিন্তু সজীব নহে - তাহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।"[২৯]

(১৩০১) "সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, ... তাহাকে সত্য এবং সরসভাবে পাঠকের মনে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনো সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করে নাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত-ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়।"[৩০]

(১৩০১) "রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয় - অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে, তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।"[৩১]

১.২.২.২. সমালোচক যখন ঔপন্যাসিক -

উপন্যাস প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে করা রবীন্দ্রনাথের অভিমতগুলি লক্ষ্য করলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। *চোখের বালি* প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যক্ত উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্যের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ সন্ধান একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু *চোখের বালি*র পর থেকে 'এই পথে আলো জেস্কলে – এ পথেই' পরবর্তী উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। লক্ষণীয় *ফুলজানি* প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ যদিও উপন্যাসে 'কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা' না করার পরামর্শ দিয়েছেন, পরবর্তী সময়ে এই মনোভাব তাঁর পরিবর্তিত হয়েছে, এই পত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালি আঁকতে পারেন নি' বলে আক্ষেপ করেছেন এবং এই অভাব পূরণের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বাঙালি এঁকেছেন। উপরন্তু 'সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত' - এমন মতের পোষক রবীন্দ্রনাথ গতিশীল বাঙালিকেই তাঁর উপন্যাসে এনেছেন। যে মধ্যবিত্ত বাঙালি তখন বাংলার সমাজ জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি রূপে পরিগণিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সাথে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায় দীনেশচন্দ্র সেনকে বলা তাঁর বক্তব্য থেকে –

> ''সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগলক্ষণ কি পাওয়া যায় তাহাই নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়।''[৩২]

আমাদের বিচারে রবীন্দ্র উপন্যাসে তৎকালীন যুগ-সমাজের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। *রাজসিংহ* উপন্যাসের সমালোচনায় উপন্যাসের চরিত্র এবং ঘটনার কার্যকারণের

বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে অভিযোগ করেছেন, চরিত্রের 'যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক', ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে কার্যকারণতত্ত্ব ও সামঞ্জস্যবোধের অনিবার্যতা সম্পর্কে এই সচেতনতা রবীন্দ্র উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু বিশ্বাস করতেন –

> "মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে স্মৃতি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি।"[৩৩]

রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্রগুলি এই 'স্থায়ী ভিত্তি'র ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার' রবীন্দ্র-উপন্যাস বিধৃত মুখ্য চরিত্রগুলির 'মূলদেশে মিলিত হয়ে যে অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে' এবং সেই 'অতিদুর্গম অন্তঃপুর'ই যখন চরিত্রের নিয়ন্তা শক্তি হয়ে যায় তখন সেই চরিত্রের সমগ্রতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রাণস্পন্দন নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে না আর। *বিনোদিনী, সুচরিতা, দামিনী, বিমলা, কুমুদিনী, এলা, এচিরা* - এঁদের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে বহুবার, একই প্রশ্ন জেগেছে রবীন্দ্র উপন্যাসের বহু নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রেও। একথা ঠিক যে এঁরা কেউই আমাদের প্রতিদিনের জগৎ সংসারে পরিচিত মুখ নয়, কিন্তু অপরিচিত হলেই অবাস্তব হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সংশ্লিষ্ট উপন্যাসে এদের কারোরই আনুপূর্বিক বিকাশে কোনোরকম অসঙ্গতি বা জীবনের স্পন্দনের অভাব লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> "পরিচিত না হলে অবাস্তব হবে এ কেমন কথা? রামমোহন খুব পরিচিত চরিত্র? শতাব্দীতে কটা পাওয়া যায়? বিদ্যাসাগর? ক'জন বিদ্যাসাগর আছে? এরা অসাধারণ তেমনি রবীন্দ্রনাথ কিছু অসচরাচর চরিত্র রচনা করেছেন, কেউ কেউ

হয়তো দুর্লভ, কেউ অসাধারণ। পরিচিত বাস্তব চরিত্রের পাশেই এরা রয়েছে। এরা অপরিচিত হলেও জীবন্ত, অপরিচিত স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।”[৩৪]

চলমান জীবনের এই বাস্তবতা নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ’ সোসাইটি নভেল এর আদর্শ গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেন নি জর্জ এলিয়ট, এমিল জোলা, টলষ্টয় - কারও আদর্শ। কেননা ‘রবীন্দ্রমননে বাস্তবতা বহির্জাগতিক বস্তুরূপের যথার্থতা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা বস্তুজগৎ’।[৩৫] অর্থাৎ উপন্যাসের শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সন্ধানী পথিক এবং পথিকৃৎ। আর এই স্বকীয় ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির জন্যই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হয়েই থেকেছেন। বাংলার বায়রন, বাংলার স্কট এ-ধরনের বিশেষণে বিশেষিত করার কোনো অবকাশ তিনি দেন নি।

১.৩. ইতিহাস থেকে ‘মধ্যবিত্তমদির জগতে’ -

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের সৃজ্যমান মধ্যবিত্ত সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোটামুটি গঠিত হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রামমোহনের সমাজসংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা জীবনাচরণে তখনও জায়গা না পেলেও মনের মধ্যে শুধু জায়গাই পায়নি, একটা দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করেছিল। বাঙালি শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে (কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মধর্মের প্রসার প্রভৃতি) সমাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। অপরদিকে ভূমি-স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজ তাদের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী রক্ষণশীলতা বা স্থবিরতার সমর্থক জীবনাচরণ করলেও এই শ্রেণীরও কেউ কেউ আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের মানসটিকেও বানিয়ে নিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার ছাঁচে। অর্থাৎ এরা ভূমি স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজের মানুষ হলেও এদের মানসপ্রকৃতি মধ্যবিত্ত সমাজাদর্শেই গঠিত হয়েছিল। *ঘরে-বাইরে*র নিখিলেশ এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। শুধু নিখিলেশ কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেওতো ছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতাপুষ্ট

অভিজাত পরিবারের মানুষ। তদানীন্তন বাংলাদেশের অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির অন্যতম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সেই সময়ের অগ্রণী মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কাছথেকে দেখেছেন এবং এরই ছত্রছায়ায় রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা, বিশেষকরে ঔপন্যাসিক মন গঠিত এবং বর্ধিত হয়েছে।

> ‘‘প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র সেন, মোহিত চন্দ্র সেন, অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি তাহার সকল বন্ধু সুহৃদ সহকর্মী সকলই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ মানসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অভিজাত মানস আশ্রিত পুষ্ট ও বর্ধিত। এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু-মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ-কোলাহল, আশা ও আকাঙ্খা নৈরাশ্য ও বিষাদ আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।’’[৩৬]

এই নবোত্থিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উস্কীপ্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথের লেখার বিষয় হওয়ার জন্য তাঁকে উপন্যাস নামক বিশিষ্ট শিল্পরূপের আশ্রয় নিতে হয়েছে। কেননা আধুনিক মানুষের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করার তাগিদেই উপন্যাস শিল্পরূপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আধুনিক কালে।

> ‘‘শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটল আধুনিক কালে - যখন, একদিকে ব্যক্তির আত্মসচেতনতার কারণে এবং অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার ফলে, গল্পও তার পুরাতন সারল্য হারিয়ে ফেলল। উপন্যাসের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে এই জটিলতার মোকাবিলা করার জন্য।’’[৩৭]

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন ‘এখনকার মানুষের প্রকৃতি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে’ – ‘অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই’। এই বোধ নিয়ে

সচেতনভাবে তিনি উপন্যাস রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। যে মধ্যবিত্ত সমাজকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন, সে সমাজ ততটা ঘটনাবহুল নয়, যতটা ভাঙাগড়া চলে এই সমাজের সচেতন মানবমনের গহীন গহ্বরে। আর এই সচেতন মনই সমাজের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, শুধু সমাজ কেন, এই মন জড়িয়ে পড়ে নিজের সাথে নিজের বিরোধেও। 'ছাঁটদেওয়া সত্যে' অবিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রটিকে নিরপেক্ষভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, বঙ্কিমের মত বিচারকের আসনে বসেননি।

> "তাঁর ভূমিকাকে বলাচলে সহানুভূতিশীল সাক্ষীর ভুমিকা। ... যে মোহাচ্ছন্নতা পূর্বাপর বাংলা উপন্যাসের প্রধান দুর্বলতা, সেই দুর্গ্রহ থেকে তার উপন্যাস একেবারেই মুক্ত।"[৩৮]

পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কথাশিল্পীদের থেকে তাঁর উপন্যাসের বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে সমালোচক অমরেশ দাশ লিখেছেন –

> "১৮৭৭-১৯৩৪ এই কয় বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি রচিত। বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজের পক্ষে সময়টা ভাঙা-গড়ার, রূপান্তরের। ... ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ - অবশ্যই শিক্ষিতজনের নানামুখী সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল এবং বদলে যাচ্ছিল অনিবার্যভাবে। বাঙালি জীবনের সেই রূপান্তরের মধ্যপর্ব থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উপাদান। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার সমাজপরিবর্তনের সূচনাকালের কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তাঁদের ছবি হয় নীতিবাদ নয় সংস্কারবাদের প্ররোচনায় খণ্ডিত ও রঞ্জিত। অনুপ্রাণিত সংস্কারকের মতো নয়, একান্ত শিল্পীর মতো পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।"[৩৯]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাসের পাশে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধৃতযোগ্য –

> "রবীন্দ্রনাথ যদিও গোরা পর্যন্ত সব উপন্যাসেই সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন, তবু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অতোখানি দূরত্বের ভাব রেখে ওপর থেকে দেখেন নি। আর শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাঠককে সম্বোধন ত' দূরের কথা, কোন নীতিগর্ভ বা জ্ঞানগর্ভ, এমনকি বন্ধুজনোচিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মন্তব্যও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চোখে পড়ে না।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত বিবৃতিকারের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কাহিনীকে দৃশ্য (Scene) বা পরিস্থিতি (Situation) রূপে উপস্থাপিত করেছেন পাঠকের সন্মুখে। মোহাচ্ছন্নতাহীন নিরপেক্ষ সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু উপন্যাসে কোনো বিরোধী মতবাদের পক্ষাবলম্বন করেন নি, তাই পাঠকের হস্তক্ষেপও সহজ হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। মানসিক দ্বন্দ্ব, মতবাদের বিরোধ, সমাজের সাথে ব্যক্তিমানসের বিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেহেতু পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তিকেই সমান দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন, তাই পাঠকের হস্তক্ষেপ সহজ হয়ে যায়, পাঠক নিজের মত তৈরি করে নিতে পারে তার অভীষ্টকে। যেমন *চোখের বালি, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ,* কিছুটা পরিমাণে *নৌকাডুবি* যেখানে রমেশ ও কমলার সম্পর্কের প্রশ্নটি এসেছে। উপন্যাসের গঠনগত ত্রুটি যাই থাক না কেন, কমলাকে রমেশের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা এবং না করা, দুটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই সমাজ-ধর্মের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ থেকেছেন, যেন পাঠকের দরবারেই তিনি প্রশ্নটি তুলে ধরলেন, এখন পাঠক তার নিজস্বতা অনুযায়ী এই প্রশ্নের উত্তর একটা গড়ে নেবেন।

১.৪. নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে -

মানবমনের গহীন অলিন্দে প্রবেশ করে তাকে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিজস্ব ফর্ম তৈরি করে নিতে হয়েছে অনবরত। 'আঁতের কথা' বের করে দেখানোর যে নতুন রীতি তিনি বংলা সাহিত্যে আনলেন সেটা যে সেই সময়ে একদম নতুন ছিল, এটাই যে বাংলা সাহিত্যের এ-ধরনের প্রথম সৃষ্টি সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ

পাওয়া যায় *চোখের বালি* সম্পর্কে পরবর্তীকালে তাঁর মূল্যায়ন থেকে। আর এই মূল্যায়ন যেহেতু অনেক পরে করা (প্রায় চল্লিশ বছর) তাই এই মূল্যায়ন লেখক রবীন্দ্রনাথের ততটা নয় যতটা পাঠক রবীন্দ্রনাথের –

> ''চোখেরবালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। ... এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজ সজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জক্কলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। তারপর ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ। ... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।''[৪১]

অর্থাৎ ঘটনা নয় ঘটনার পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তাই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট, যেটুকু ঘটনার উল্লেখ তাকে বলা যেতে পারে 'অনিবার্য ছল'। ঘটনা নয় বরং ব্যক্তিচরিত্রের সম্ভবপরতা যে রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ছিল তা বোঝা যায় তাঁর বক্তব্য থেকে –

> ''মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে, সেইগুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই-রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করেছে। এইজন্য সেই মানব চরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।''[৪২]

বঙ্কিমের উপন্যাসে কাহিনী মুখ্য স্থান অধিকার করায় চরিত্র এই কাহিনীকে পুষ্ট করার কাজে

নিয়োজিত হয়েছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে জীবনের দীর্ঘপথের আলো-আঁধারিতে, আনন্দ-বেদনায় বিপন্ন মুহূর্তে উত্তরণের গভীর আর্তিতে চরিত্রের 'হয়ে ওঠা'র (becoming) ইতিবৃত্ত রচনায় মনোযোগী হওয়ায় তাঁর সৃষ্ট ঘটনা অনিবার্যভাবেই চরিত্রের এই বিবর্তনকে পুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কাহিনীর নানা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে চরিত্রের রহস্যজটিল অন্তর্লোকের উন্মোচন এবং ব্যক্তিসত্তার আদি মধ্য অন্ত্যব্যাপী বিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় কাহিনীর ভূমিকা বা গুরুত্ব ততখানিই স্বীকৃত হয়েছে, যতটা চরিত্রের হয়েওঠার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাথে রবীন্দ্র উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন –

> " উপন্যাসের কথারস রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তিকে কোনোদিনই তেমন দুর্বার আকর্ষণে টানেনি। রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত চরিত্রই আকর্ষণ করেছে। চরিত্র বললেও হয়তো সবটা বলা হয় না - ব্যক্তিত্ব বললে কথাটা আরো স্পষ্ট হয়। সেইটুকু প্লটকেই এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে, যার পাকে পাকে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব রচিত হয়েছে।"[৪৩]

অনুরূপ মত পাওয়া যায় ভূদেব চৌধুরীর লেখা থেকেও। বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন –

> "... রবীন্দ্রনাথ মানুষকে, ব্যক্তিমাত্রকেই ভেতর হতে দেখতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের দৃষ্টি জীবনের বাইরের ঘটনাপ্রবাহের অনুসরণে অন্তর্মুখী হতে চেয়েছে যথাসম্ভব; রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অন্তঃকরণের প্রবণতার প্রেক্ষিতেই তার বহির্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবস্থান্তরের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। এই অর্থেই রবীন্দ্র-উপন্যাস ঘটনাপ্রাধান্যের জগৎ ছেড়ে মনোরহস্যানুসন্ধানের অভিমুখী হয়েছে।"[৪৪]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবোধ এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক মনের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্রেরা এই বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বকেই রবীন্দ্রনাথ

উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি –

> "আত্ম সচেতনতাই আধুনিক মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ... বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই আত্মসচেতন শিল্পী, কিন্তু তার চরিত্রেরা আত্মসচেতন মানুষ নয়। রবীন্দ্র উপন্যাসে সৃষ্টি ও স্রষ্টা দু-পক্ষই পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ... চোখে পড়ে তার উপন্যাস ঘটনা প্রধান নয় বঙ্কিমের মত, তার উপন্যাসের প্রধান সমস্যা সমাজনীতির নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের। ... আর এই কারণেই বঙ্কিমী উপন্যাসের প্লট প্রাধান্য ধীরে ধীরে খসিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ক্রমেই হয়ে উঠেছে থিম প্রধান। ... ঘটনা নয় বরং ঘটনার পেছনে অবচেতনের যে স্তরটি ক্রিয়াশীল, তাই চোখের বালির মূল বক্তব্য। ... এ তো শুধু একজন রমণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প নয়, ভিতরে ভিতরে অন্তঃশীল রয়েছে সামাজির শক্তির সংঘাতও, বিনোদিনীর আত্মবিকাশের পেছনে রয়েছে মহেন্দ্রর ফিউডাল বোধের সঙ্গে বিনোদিনীর গণতান্ত্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরোধ। বিষবৃক্ষর কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধজলে ঝাঁপ দিয়েছে - বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সু নিয়ন্ত্রিত। কুন্দনন্দিনী ঘটনার সৃজন কিন্তু বিনোদিনী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ঘটনা প্রবাহের স্রষ্টা। কুন্দনন্দিনী আত্মবিলোপে উৎসুক, বিনোদিনী আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উত্তেজিত। কুন্দনন্দিনীর প্রেম কুন্দনন্দিনীর স্রষ্টার কাছে নিন্দনীয়, বিনোদিনীর স্রষ্টা মনেকরেন বিনোদিনীর প্রেম নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় সেই প্রশ্নই অবান্তর সেই প্রেম আছে, তার সেই অস্তিত্বটাই বড় কথা।"[৪৫]

অর্থাৎ বঙ্কিমের মত বিষবৃক্ষের বিষময় ফল দেখিয়ে *চোখের বালি* এবং *চতুরঙ্গ* নিঃশেষ হয়ে যায়নি, বিনোদিনী এবং দামিনীর প্রেম ও জীবনানুরাগের বাস্তব সত্য ফুটে উঠেছে উপন্যাস দুটিতে, এখানেই বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ, তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এর সাথে একথাও মনেরাখতে হবে রবীন্দ্র উপন্যাসের সব চরিত্রই কিন্তু আত্মসচেতন আধুনিক চরিত্র নয়,

বিনোদিনী বিধবা, এই উপন্যাসেই রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা - এই দুই বিধবাও আছেন, যারা সামন্তমানসিকতাপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতনভাবেই এই দুই ধরনের বিধবাকে এমন ভাবে পাশাপাশি রেখেছেন যাতে বিধবা বিনোদিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আমরা বুঝতে পারি রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, ক্ষেমঙ্করী ও হরিমোহিনী প্রভৃতি বিধবার আর্কিটাইপের বিপরীত দ্বিবাচনিকতার সূত্রে, এরা যেন বিনোদিনীর দ্বিবাচনিক অপরসত্ত্বা।

১.৪.১. মুক্ত পাঠকৃতি -

এইভাবে দেখাযাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বের জন্যই উনিশ শতকী প্লটের মোহ ঘুঁচিয়ে নিজস্ব একটি উপন্যাসশৈলী তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর এ কারণেই বঙ্কিমী উপন্যাসভাবনায় লালিত সমালোচকমন রবীন্দ্র উপন্যাসে বাস্তবতার সন্ধান পান না, কিংবা কোন কোন বইকে মনেহয় 'অত্যন্ত পাতলা হাওয়ার' বই। আসলে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে উপন্যাসে ঠাঁই দিলেও এই বাস্তব কখনও রূঢ় বাস্তব হয়ে ওঠেনি। একারণেই তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতা আছে, Naturalism নেই। মহেন্দ্র, সন্দীপ, শ্যামা এরা তাঁর উপন্যাসে থাকলেও এরা কিন্তু কখনোই এদের কুশ্রীতাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি যাতে উপন্যাসের থিম ঢাকা পড়ে যায়, অথচ সুযোগ ছিল। মনস্তত্ত্বের জটিল গহীন গহ্বরে প্রবেশ করে 'আপনার রহস্যে আপনি একাকী' যে মানুষ, তাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, ফলে তাঁর দায়িত্ব হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। এক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চেয়ে ব্যঞ্জনা সংকেতের ওপর রবীন্দ্রনাথ বেশিমাত্রায় নির্ভর করেছেন। ঘটনার ডিটেলিং না থাকায় 'এদের জীবন ও ব্যক্তিত্বের অনেকটাই যেন প্রচ্ছন্ন, জীবনরহস্যের অর্ধস্ফুট আলোছায়ায় অনতিব্যক্ত'[৪৬] থেকেছে। প্রথাসিদ্ধ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চাইতে 'ব্যঞ্জনা-সংকেতের অভিভব' চরিত্রের যে 'প্রবল অন্তর্গূঢ় সংবেগ' সৃষ্টি করেছে তা উপন্যাসগুলোকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। বলা বাহুল্য *চোখের বালি* থেকে *চারঅধ্যায়* পর্যন্ত যাত্রাপথে এই ব্যঞ্জনাধর্মীতা ক্রমশঃ প্রবল হয়েছে। এরসাথে মিশেছে নির্মোহ দৃষ্টিতে নিজেকে

একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে রেখে ঘটনার বর্ণনা করা। ফলত 'সু' বা 'কু' কোনোটারই চরম প্রকাশ তিনি বিস্তারিত করেননি। শচীশের আত্মানুসন্ধানের দ্বিবাচনিকতাসূত্রে ধর্মের অসারতা বোঝাতে ননিবালার মৃত্যু প্রসঙ্গ যেমন কয়েকটি লাইনে মাত্র প্রকাশ করেন, শচীশের আত্ম-উপলব্ধির মুহূর্তটিও তেমনি ফেনিয়ে বলা হয় না। সন্দীপের নারী আসক্তি কয়েকটি বাক্যে যেমন প্রকাশিত হয়, বিমলার উত্তরণের দিকটিও পৃষ্ঠার পর পষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত করা হয় না। নিখিলেশ তার ভালোমানুষীর সাথে তার দুর্বলতাকেও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তুলে ধরেন। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তর্বয়নের ক্ষেত্রেও 'সু' বা 'কু' দুটোকেই রবীন্দ্রনাথ সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেন জন্যই ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে তাঁর উপন্যাস উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। আর সমাপ্তি সম্পর্কে সমালোচকদের যে আপত্তি তা আসলে উপন্যাসগুলির মুক্ত উপসংহার এর দিকেই না বুঝে তর্জনীসংকেত। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আমাদের মতের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে –

> "বিগতকালের উপন্যাসে পরিণতি সাধারণত যে বৃত্তায়িত পূর্ণতা লাভ করত, আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখি সেখানে অসম্পূর্ণতাই যুগলক্ষণ। বস্তুত বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের পরিণতি যে সংবৃত (Closed) সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসেই কি সেরকম ঘটেছে, নাকি অনেক ক্ষেত্রেই এডউইন ম্যুর যাকে বলেছেন Organic imperfection যা একালের জীবনবোধের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত - সেই সম্পূর্ণতাধর্মী বিবৃত (Open) রূপের প্রতিফলন চোখে পড়ে ?"[৪৭]

এই মুক্ত উপসংহার কোনো ত্রুটি নয়, বরং এর ফলে পাঠকের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রসারিত করেছেন। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা থেকে বোঝাযায় তিনি পাঠককে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছেন, সচেতনভাবেই তিনি কিভাবে তাঁর উপন্যাসের এই মুক্ত পরিসরগুলি রেখেছেন, –

> "আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত

করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার শিল্পকাজ। এর ভেতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করার থাকে, সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। ... শেক্সপীয়রের ওথেলো। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য কি তিনি মুশকিলে পড়বেন। ভেবেচিন্তে যদি বা কোনো উত্তর দেন, নিশ্চয়ই সেটা ভুল উত্তর হবে। ... তাই বলছিলুম ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা হচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়ছে এবং লেখকের ভালমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বস্তুত মানুষ ঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা অংশের মধ্যে যে সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায় মানুষের না দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, অতএব আসল সত্যটাযে প্রত্যক্ষের ওপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে।'[৪৯] অন্যত্র – 'মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসঙ্গত নহে; তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর; তাহার সদর-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ।'[৫০] আইফর ইভান্স আধুনিক উপন্যাসের প্রধান অন্বিষ্ট বলতে যে 'exploration of the individual personality'র কথা বলেছেন, ব্যক্তিসত্তার সেই নিগূঢ় চেতনার প্রকাশের তাড়নায় মানুষের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্লটের মোহ ত্যাগ করে থিমের দিকে ঝুঁকেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে নিজস্ব ফর্ম। 'সাহিত্যের যে রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনোই যথার্থ আনন্দ হতে পারে না' - এই যাঁর অভিমত, তাঁকে অনিবার্যভাবেই নতুন টেকনিকের আবিস্কার করতে হয়েছে, আর বিষয়

যেহেতু অবচেতন মনের ক্রিয়া তাই ক্রমশঃ তিনি ঘটনা বলার দায়িত্বও চরিত্রের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রের পরিবর্তমান Shifting দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের ওপর আলো ফেলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে Narratology নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। কনটেন্ট অনুযায়ী যে নির্দিষ্ট ফর্ম বা প্রকরণের আশ্রয় নিতে হয়, ফর্ম ও কনটেন্টের সার্থক সমন্বয়ই যে সার্থক উপন্যাসশিল্পের 'আঁতের কথা', সে সম্পর্কে সচেতন রবীন্দ্রনাথকে অনিবার্যভাবেই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বক্তব্য বা বিষয়বস্তুকে যথাযোগ্যভাবে রূপায়িত করার প্রয়োজনে ফর্ম-এরও বদল ঘটাতে হয়েছে।

> "এই নিত্যনবায়মান পরিবর্তন-সংঘটন যে কেবল এক্সপেরিমেন্টের শৌখীন খেয়ালে হয় নি, হয়েছে অ্যারিষ্টটল কথিত অনিবার্যতার তাগিদে, তা অবশই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে পাঠককে।"[৫১]

১.৫. শেষ কথা নয় ঃ শেষের কথা -

রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোচনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা যেতে পারে। বর্তমান গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য যেহেতু পাঠ প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের আলোকে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাসের পুনঃপাঠ, তাই এই অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসের বিষয়, প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা কি ছিল, মূলতঃ এই কয়টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাথে তুলনা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়েছে, রবীন্দ্র উপন্যাসের বিশেষত্ব অনুধাবন করার লক্ষ্যে। *রাজসিংহ* উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> "বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতেও ছাড়েন নাই।"[৫২]

রবীন্দ্র উপন্যাসে এ-ধরনের 'ধমক'এর অনুপস্থিতি পাঠকৃতিতে পাঠকের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করেছে।

নির্দেশিকা ঃ-

১. দাশ, অমরেশ ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ২০০২, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২২

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা ঃ ১৩৮৭, পৃঃ ১৭৯

বসু, বুদ্ধদেব ঃ *রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য*, নিউ এজ, কলকাতা ঃ ১৯৬২, পৃঃ ১৬

চৌধুরী, বিশ্বপতি ঃ *কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ঃ ১৯৬২, পৃঃ ১৩

৩. *আত্মপরিচয়* ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ১৮৯

৪. দাস, বেলা ঃ *বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা ঃ ১৯৯১, পৃঃ ১৫-১৬

৫. রায়, দেবেশ ঃ *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ, কলকাতা ঃ ১৯৯১, পৃঃ ১৪-১৫

৬. রায়, নীহাররঞ্জন ঃ *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ, কলকাতা ঃ ১৩৬৯, পৃঃ ৩৯২

৭. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান ঃ *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ২২

৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ, কলকাতা ঃ ১৯৮৩, পৃঃ ২৫২-৫৩

৯. ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঃ *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ, কলকাতা ঃ ২০০৮, পৃঃ ২৬

১০. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ঃ *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা ঃ ১৪১১, পৃঃ ৮৬

১২. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩

১৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প*, দে'জ, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ গ

১৪. তদেব, পৃঃ ৯৬

১৫. *ছিন্নপত্র*, পত্র সংখ্যা - ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৮২, পৃঃ ১৩

১৬. তদেব, পত্র সংখ্যা - ৫, পৃঃ ১৫-১৬

১৭. ''আলোচনা''। *সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৪০১, পৃঃ ১৯৬-৯৭

১৮. ''সাহিত্য''। *সাহিত্য*, পৃঃ ২০২

১৯. তদেব, পৃঃ ২০৪-০৫

২০. ''সাহিত্যের প্রাণ''। *সাহিত্য*, পৃঃ ২১৫

২১. তদেব, পৃঃ ২১৬

২২. ''মানব প্রকাশ''। *সাহিত্য*, পৃঃ ২২৩

২৩. তদেব, পৃঃ ২২৪-২৫

২৪. তদেব, পৃঃ ২২৬

২৫. ''রাজসিংহ''। *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৬৪

২৬. তদেব, পৃঃ ৪৬৫

২৭. ''সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ''। *পঞ্চভূত*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৯১, পৃঃ ৬৩১

২৮. ''সাহিত্যের গৌরব''। *সাহিত্য*, পৃঃ ২৪৮

২৯. ''যুগান্তর''। *আধুনিক সাহিত্য*, পৃঃ ৪৭৭

৩০. তদেব, পৃঃ ৪৭৭

৩১. তদেব, পৃঃ ৪৭৮

৩২. চৌধুরী, ভূদেব ঃ *রবীন্দ্র-উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*, দে'জ, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯

৩৩. ''অখণ্ডতা''। *পঞ্চভূত*, পৃঃ ৫৯০

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায়, মানব ঃ *নির্মাণে বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ*, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ১৮

৩৫. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ৩৫

৩৬. রায়, নীহাররঞ্জন ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৪

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ১

৩৮. সিকদার, অশ্রুকুমার ঃ *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* অরুণা, কলকাতা ঃ ১৩৯৫, পৃঃ ২

৩৯. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩-৪৪

৪০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩

৪১. সূচনা, *চোখের বালি,* রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪

৪২. গ্রন্থপরিচয়, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪

৪৩. রায়, রথীন্দ্রনাথ ঃ *রবীন্দ্র-মনন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ১৯৮৭, পৃঃ ১৬৫

৪৪. চৌধুরী, ভূদেব ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩

৪৫. সিকদার, অশ্রুকুমার ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৪

৪৬. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫

৪৭. তদেব, পৃঃ ১২৭

৪৮. গ্রন্থপরিচয়, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪

৪৯. ''সৌন্দর্যবোধ''। *সাহিত্য,* পৃঃ ৩১

৫০. ''সাহিত্যের তাৎপর্য''। *সাহিত্য,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০

৫১. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭

৫২. ''রাজসিংহ''। *আধুনিক সাহিত্য,* পৃঃ ৪৬৩